হযরত ফাতেমা (সা.আ.)

প্রবন্ধ › আহলে বাইত › হযরত ফাতিমা (সা.আ.)

প্রকাশিত হয়েছে **2014-02-13 00:00:00**

بسم الله الرحمن الرحيم

কোন মাযহাব বা মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি স্তরে সে মতাদর্শের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং মৌলিক রীতিনীতি সমূহের বাস্তবায়ন। যে কোন মাযহাব বা মতাদর্শ, সেটি ঐশ্বরিক হোক অথবা মানব রচিতই হোক এবং তা যতই পরিকল্পিত, পরিমার্জিত, পরিশোধিত ও বিজ্ঞানসম্মত হোক না কেন ? সেটি যদি মানব সমাজে বাস্তবায়ন করা না হয় বা চলমান সমাজে তার কোনো কার্যকরী ভূমিকা না থাকে, তবে তা কখনোই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনা। পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি যুগের জন্যই একজন নেতা বা একজন ইমাম নির্বাচন করেছেন, যিনি তাঁর শরীয়তের বাস্তবায়নকারী, ব্যাখ্যা প্রদানকারী এবং রক্ষণা বেক্ষণকারী।

আর এ ইমামগণ হচ্ছেন নবী করিম (সা.) এর পবিত্র বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত। আর এ বেলায়েত ও ইমামতের আধার হচ্ছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কলিজার টুকরা, জ্ঞানের দরজা হযরত আলীর (আ.) স্ত্রী, বেহেশতের যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইনের (আ.) মাতা হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (সা.আ.)। যিনি সমগ্র বিশ্বের নারী জাতির আদর্শ, বেহেশতের নারীদের নেত্রী, পবিত্র কোরআন এবং অসংখ্য হাদীস কর্তৃক ঘোষিত একমাত্র নিস্পাপ নারী। আমরা যদি তাঁর জীবনীর দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে আমাদের জন্য চরম ও পরম শিক্ষা এবং সেটি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, আধ্যাত্মিক, ধৈর্য্য সংযম ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ একজন সত্যিকার মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, এর সবকিছুই ছিল তাঁর মধ্যে।

বর্তমানে আমাদের দেশে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হল নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রত্যয়, যেমন নারী উন্নয়ন, নারী নীতি, নারী অধিকার, পিতার সম্পত্তিতে সম-অধিকার ইত্যাদি। যারা মুখে এসব বুলি আওড়াচ্ছেন তারা মূলত: বিভিন্নভাবে নারীদের বিভিন্ন ফাঁদে ফেলছেন। তারা নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছেন। এরাই একদিন নারীদের মানবসমাজ বহির্ভূত বিনোদন উপযোগী প্রাণী মনে করতো, তাদেরকে ভূত-প্রেত ভাবতো। তাদের বিকৃত রুচির পরিতৃপ্তির জন্য নারী নামের পুতুলকে কিভাবে সাজানো যায় এবং তাদেরকে ভোগের প্রসাদ হিসেবে কিভাবে তার উৎকৃষ্ট ব্যবহার করা যায়, এসব নষ্ট চিন্তা ও পরিকল্পনাকে তারা নারী অধিকার, নারী মুক্তি ইত্যাদির সুশোভন মোড়কে বাজারজাত করছে।
অথচ ইসলাম শুরু থেকেই নারীর যথাযথ প্রাপ্য সম্মান এবং প্রায় সকলক্ষেত্রেই পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী নারী ও পুরুষ সকলেই সমান। কাজের ক্ষেত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধির মাপে তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও ইসলাম মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দিয়েছে। ইতিহাসে এমন কিছু সংখ্যক মহীয়সী মহিলাকে দেখা যায়, যারা স্বীয় গুণে অসংখ্য পূণ্যবান পুরুষদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন হযরত ফাতেমা (সা.আ.), হযরত খাদিজা (আ.), হযরত মারিয়াম (আ.) ও হযরত আসিয়া (রা.)। হযরত ফাতেমা ইহকাল ও পরকালের নারীকূলের নেত্রী। হযরত ফাতেমা (সা.আ.) এর মাধ্যমেই দুনিয়ার বুকে ইমামতের ধারা চালু রয়েছে। তিনিই রাসূল (সা.) এর বংশধর রক্ষায় প্রজ্বলিত শিখা।

একজন পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ হিসেবে হযরত ফাতেমা (সা.আ.) প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, পরিপূর্ণতার শিখরে ওঠার জন্য নারী হওয়া বা পুরুষ হওয়া জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় কোন শর্ত নয়। তাঁর জন্মকালীন সময়ে আরবে কন্যাসন্তানকে কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না, কন্যাসন্তানের জন্মকে লজ্জাজনক মনে করা হতো, এমন কি জীবন্ত মাটির নিচে পুতে ফেলা হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের ঘরে একজন কন্যা সন্তান পাঠিয়ে নারী জাতির জন্য অশেষ সম্মান ও মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। নবী করিম (সা.) এর কোন জীবিত পূত্রসন্তান না থাকায় মক্কার কাফেররা তাঁকে "আবতার" বা নির্বংশ বলে বিদ্রূপ করতো। এ বিদ্রূপের জবাবে আল্লাহপাক 'সূরা কাওসার' নাজিল করেছেন এবং বিদ্রূপকারীদেরকেই বরং উল্টা নির্বংশ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সত্যিই যারা নবী (সা.) কে নির্বংশ বলে উপহাস করতো, সময়ের ব্যবধানে আজ তারাই নির্বংশ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর নবী পাক (সা.) এর পবিত্র বংশধারা নিরন্তর টিকে আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে টিকে থাকবে।

হযরত খাদিজার গর্ভকালীন সময়ে তাঁকে সাহায্য করার মত কেউ ছিলেন না। এ চরম সঙ্কটময় মূহুর্তে কোন মহিলাই তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেননি বরং বিভিন্ন ধরনের কটু কথা বলেছেন। যখন তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন ঘরে তিনি একাই ছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘরে চার জন অপূর্ব লাবণ্যময়ী রমণীকে দেখতে পেলেন। তাদের অত্যুজ্জল লাবণ্যচ্ছটায় ঘর আলোকিত হয়ে উঠলো। তাঁরা বললেন আমরা আল্লাহর নির্দেশে তোমার পরিচর্যার জন্য আগমণ করেছি। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, ভয় পেওনা আমি সারা, ইনি আসিয়া-ফেরাউনের স্ত্রী, ইনি মরিয়ম এবং উনি কুলছুম। আমরা তোমাকে সাহায্য করার জন্য এসেছি।

জন্ম :

রাসূল (সা.) এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর ২০'শে জমাদিউসসানি রোজ শুক্রবার, মক্কার শুষ্ক ও প্রস্তরময় পর্বতের পাদদেশে কাবার সন্নিকটে, ওহী নাযিলের গৃহ, যে গৃহে সর্বদা ফেরেশতাগণ আসা-যাওয়া করতেন, যেখানে সকাল-সন্ধায় রাসূলের (সা.) সুমধুর কন্ঠে পবিত্র কোরআনের বাণী ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হতো, ইয়াতিম নি:স্ব ও নিপীড়িতদের আশ্রয়স্থল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খাদিজার গৃহ আলোকিত করে নারীকূল শিরোমণি বেহেশতের নারীদের নেত্রী হযরত ফাতেমা (সা.) দুনিয়ায় আগমন করেন।

নাম :

জন্মের পর নবী করিম (সা.) তাঁর আদরের কন্যার নাম রাখেন ফাতেমা। এ নামের অর্থ হলো, 'যাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে'। যেহেতু তিনি অন্য সমস্ত নারী হতে অধিক মর্যাদার অধিকারী, তাই তাকে এ নাম দেয়া হয়েছে। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেছেন, তিনি {হযরত ফাতেমা (সা.আ.)} যাবতীয় নৈতিক ও চারিত্রিক অপকৃষ্টতা থেকে দূরে ছিলেন, আর এ কারণেই তাঁকে ফাতেমা বলা হয়েছে।

উপনাম :

উম্মুল হাসান, উম্মুল হোসাইন, উম্মুল মুহসিন, উম্মুল আয়েম্মা এবং উম্মে আবিহা। যার অর্থ হল পিতার মাতা। কারণ ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কষ্ট বা বেদনার ফলে তাঁর পিতা যেসব অস্বস্তি বা দূর্ভোগের সম্মুখীন হতেন, তা দূর করতে এবং পিতার প্রশান্তির জন্য মা ফাতেমা (সা.আ.) এত বেশি প্রচেষ্টা চালাতেন যে, তা সন্তানের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা ও ব্যথিত চিত্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপাধি :

সিদ্দিকাহ্ (সত্যবাদিনী)।

মুবারাকাহ্ (বরকতময়ী)।

তাহেরাহ্ (পবিত্র)।

জাকিয়াহ্ (পরিশুদ্ধতার অধিকারী)।

রাজিয়া (সন্তোষ্ট)।

মারজীয়াহ্ (সন্তোষপ্রাপ্ত)।

মুহাদ্দিসাহ্ (হাদীস বর্ণনাকারী),

বাতুল, সাইয়্যেদাতুন নিসা ও যাহরা (প্রস্ফল)

তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুখে-দু:খে, আপদে-বিপদে অবিচল ভাবে আল্লাহর মর্জির ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন এবং নির্ভরশীল ছিলেন। এজন্যই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'রাজিয়া-মারজিয়া'।

'যাকিয়া' নামকরণ করা হয়েছিল এজন্য যে, তিনি যেমন ছিলেন সতী-সাধ্বী, তেমনি কঠোর ত্যাগ ও সাধনা দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্ব করে ছিলেন। দেহ, মন এবং আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে নিয়েছিলেন।

তিনি পার্থিব ভোগ লিপ্সা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে 'বাতুল' বলা হতো।

আর তিনি 'সাইয়্যেদা' নামে ভূষিত হয়েছিলেন এই কারণে যে, সাইয়্যেদা অর্থ শ্রেষ্ঠা এবং সর্দার। বস্তুত:পক্ষে দুনিয়ায় তিনি যেমন নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, তেমনি বেহেশতেও রমণীকূলের সর্দার বা রাণী।

'যাহরা' অর্থ কুসুমকলি। বাস্তবিকপক্ষে বিবি ফাতেমা (সা.আ.) একটি অনুপম সুন্দর সুরভিত কুসুমকলির মতই রূপে ও গুণে সুশোভিত ছিলেন।

ইতিহাসবিদ ও মুফাসসীরগণ হযরত ফাতেমা (সা.আ.) এর আরো বহু উপাধির কথা বললেও তিনি 'ফাতেমা-তুয-যাহরা' নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।

পিতা :

হযরত ফাতেমার (সা.আ.) পিতা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি এমন এক পিতা ছিলেন, যাকে বিশ্বস্রষ্টা সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর পবিত্র কোরআনে তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে :

" يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ ۝ الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا "

অর্থাৎ "তিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না। বরং (তাঁর কথা) ওহী বৈ কিছু নয়, যা তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়"।(সূরা আন নাজম, আয়াত: ৩-৪) ফাতেমা তাঁর জ্যোতির্ময় জীবনের সবটুকুই ওহীর সংস্পর্শে এবং মানবতার মূর্ত প্রতীক এমনই একজন পিতার ছায়াতলে অতিবাহিত করেন।

মাতা :

আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রথম স্ত্রী, সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী নারী, মক্কার সম্ভ্রান্ত রমণী হযরত খাদিজাতুল কুবরা। নবী (সা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: খাদীজা আমার উম্মতের সর্বোত্তম নারীদের অন্যতম। হযরত খাদীজা রাসূল (সা.)-এর নিকট এতই সম্মানিত ও প্রিয় পাত্রী ছিলেন যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোন নারীকে বিয়ে করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর নবী (সা.) সব সময় তাঁর স্মৃতিচারণ করতেন। হযরত আয়েশা বলেন : রাসূল (সা.) এত বেশি খাদীজার কথা স্মরণ করতেন যে, একদিন আমি প্রতিবাদ করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, খাদীজা তো একজন বৃদ্ধা ব্যতীত আর কিছু ছিলেন না। আল্লাহ তাঁর চেয়ে উত্তম আপনাকে দান করেছেন। তখন রাসূলে আকরাম (সা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন: আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেয়ে উত্তম কোন স্ত্রী আমাকে দান করেননি। খাদীজা এমন

সময় আমার প্রতি ঈমান এনেছিল, যখন সবাই কুফরের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। সে এমন সময় আমার কথা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যখন অন্যরা সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল। খাদীজা এমন সময় তাঁর সর্বস্ব আমার কাছে অর্পণ করেছিলেন, যখন অন্য সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছিল। আল্লাহ তা'আলা আমার বংশধারা তাঁর মাধ্যমেই অব্যাহত রেখেছেন। এটা সত্যি যে, হযরত খাদীজার আত্মত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গ নবী (সা.) এর রেসালাতের অগ্রগতির পেছনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হযরত খাদিজা (আ.) রাসূলল্লাহর (সা.) নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক প্রতিটি ব্যাপারেই দৃঢ়তার সাথে তার পাশে থেকে যেভাবে তাঁকে সাহস দান করেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই বললেই চলে। কোন কোন মনীষীর মতে, ইসলাম এবং মহানবী (সা.) এর মিশন হযরত আলীর জিহাদ আর হযরত খাদীজার দানের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দুই মহান ব্যক্তিকে তাঁর রাসূলের প্রধান সহযোগী হিসেবে মনোনীত করেছেন। হযরত আলীর তরবারী এবং হযরত খাদীজার দান ইসলামের বিজয় ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের সর্বকালের সকল মুসলমান ইসলামের ন্যায় মহান নেয়ামতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর পর এ দুই ব্যক্তির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। হ্যাঁ, হযরত ফাতেমা এমনই এক মাতার স্মৃতিচিহ্ন আর এমনই এক পিতার সন্তান। হযরত ফাতেমা নবুয়্যতের দশম বছরে হযরত খাদীজার ওফাতের পর আত্মোৎসর্গকারিনী, স্নেহময়ী ও মমতাময়ী মায়ের কোল চিরতরে হারিয়ে ফেলেন। আর তখন থেকেই শিশু ফাতেমা নবী পরিবারে তাঁর মায়ের শুন্য স্থান পূরণ করেছেন।

শাহাদত :

একাদশ হিজরীতে পবিত্র মক্কা নগরীতে রাসূল (সা.) এর ওফাতের আড়াই মাস পর তিনি শাহাদত বরণ করেন। রাজনৈতিক এবং তাঁর ওসিয়তের কারণে রাতের অন্ধকারে নিভৃত ও গোপনে আমিরুল মু'মিনীন তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন করেন। তাকে কোথায় দাফন করা হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়েছে। তাঁর মাত্র ১৮ বছর মতান্তরে ২২ বছরের স্বল্পকালীন জীবদ্দশায় বিচ্ছুরিত সুবিশাল ব্যক্তিত্ব হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে হেদায়েতের পথ নির্দেশনা দান করে আসছে।

সন্তান: ইমাম হাসান মুজতাবা, সাইয়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন, জয়নাব আল কুবরা, উম্মে কুলসুম, মুহসিন (মাতৃ গর্ভেই তার মৃত্যু হয়)।

শৈশব কাল :

হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (সা.আ.) এমন এক পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছেন, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যে পরিবার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার এবং যে পরিবার নৈতিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার অশেষ ফল্গুধারার উৎস। তিনি শৈশবকালেই তাঁর মহিমান্বিতা আত্মোৎসর্গী মাতা হযরত খাদিজা কুবরা (আ.) কে চিরতরে হারিয়ে ফেলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। মক্কা জীবনে মুশরিক কোরাইশরা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর প্রচন্ড অত্যাচার করেছিল। প্রায় দুই বছর বয়সেই তিনি পিতার সাথে কাফেরদের বয়কট ও অবরোধের শিকার হন। তাদেরকে তিন বছর শো'বে আবু তালিব উপত্যকায় ভীষণ দু:খ-কষ্ট ও ক্ষুধা-যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। তিনি পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুসলমানদের সীমাহীন ধৈর্য ও কষ্ট সরাসরি উপলব্ধি করেছেন। হযরত ফাতেমা (সা.আ.) শৈশবেই মক্কার সংগ্রামী জীবনের কষ্টকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। নবুয়্যতের দশম বছরে শো'বে আবি তালিব থেকে মুক্তির কিছুদিন পরই তিনি তাঁর সম্মানিতা মাতাকে হারিয়ে ফেলেন, যিনি দশ বছর দু:খ-বেদনা বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবরোধের ভীষণ চাপের মুখে ধৈর্যধারণ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ইতোমধ্যেই রাসূল (সা.) তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়

চাচা আবু তালিবকেও হারিয়ে ফেলেছেন। এ সময় মাতাময়ী হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (সা.আ.) পিতার দু:খ ও বেদনা লাঘবে সবচেয়ে বড় সহায় হিসেবে সব সময় তাঁর পাশে থেকেছেন। হাদীস শরীফ এবং ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, একদিন নবী করিম (সা.) মসজিদে হারামে নামাজ পড়ছিলেন, তখন আবু জেহেল তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল এবং সেজদারত অবস্থায় তাঁর ওপর পচা দূর্গন্ধময় উঠের নাড়ি ভূড়ি চাপিয়ে দিল। হযরত যাহরা (সা.আ.) তখন অতি অল্প বয়স্কা হওয়া সত্বেও এ সংবাদ পাওয়া মাত্র হন্তদন্ত হয়ে মসজিদের দিকে ছুটে চললেন এবং রাসূল (সা.) এর পিঠ থেকে তা নামিয়ে ফেললেন।

হিজরত :

যে বছর হযরত খাদিজার ইন্তেকাল করেন, সে বছরেই নবী (সা.) তাঁর নিবেদিতপ্রাণ চাচা ও অন্য আরেক জন বড় পৃষ্ঠপোষক আবু তালিবকেও হারিয়ে ফেলেন। জনাব আবু তালিব রাসূল (সা.) এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। কোরাইশদের নেতা ও মক্কার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হিসেবে মক্কাবাসী ও কোরাইশদের ওপর প্রভাব থাকায় তিনি নবী (সা.) ও মুসলমানদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক বলে গণ্য হতেন। আর সে জন্য তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততোদিন কোরাইশ কাফেররা কখনোই মহানবী (সা.) এর দিকে হাত বাড়াতে পারেনি। হযরত আবু তালিব তাঁর সমগ্র জীবনে কখনো রাসূল (সা.) এর সেবা ও তাকে সমর্থন দানের ক্ষেত্রে ত্রুটি করেননি, এমনকি কোরাইশদের চক্রান্তের মোকাবেলায় এক শক্ত প্রাচীর হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে নিজের ঈমান ও ইসলাম গ্রহণকে গোপন করে রেখেছিলেন। তিনি মুশরিকদের নিকট বাহ্যিকভাবে দেখাতেন যে, আত্মীয়তার কারণে মুহাম্মদকে সহায়তা দান করছেন। হযরত আবু তালিবের এ ধরনের কর্মকৌশলের কারণে কোরাইশরা তাঁকে নিজেদের লোক বলে মনে করতো এবং তাঁর ভয় ও সম্মানের কারণে তারা নবী (সা.) কে হত্যা করার কোন পরিকল্পনা হাতে নিতে পারেনি, সাহস করেনি। আর এভাবে আত্মত্যাগ ও ঈমান গোপন করার কারণে মুসলমানদের বিভিন্ন ফের্কার আনাড়ী আলেমরা আবু তালিবের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। অথচ যিনি আপাদমস্তক ঈমান ও ত্যাগের মহীমায় বলীয়ান ছিলেন, তাঁকে শিরক ও কুফরের মত জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক অপবাদ দিতে কুন্ঠাবোধ করেননি (লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া ও অন্যান্য উমাইয়া শাসকদের আমলে এ ধরনের অপবাদের প্রচলন ঘটে। তারা আমিরুল মু'মিনীন আলীর সাথে শত্রুতার কারণে এ ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছিল)। তবে একথা ঠিক যে,হযরত আবু তালিবের মৃত্যুর সাথে সাথে রাসূল (সা.) এর জন্য দায়িত্ব পালন করা আরো বেশী কঠিন হয়ে যায় এবং কোরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়, আর তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে তারা রাসূলে খোদার প্রাণনাশের পরিকল্পনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে বিভিন্ন গোত্র থেকে লোকজন নিয়ে হযরত মুহাম্মদের (সা.) গৃহ ঘেরাও করে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে হযরতকে হত্যা করা হবে। আর এভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হত্যার দায়ভার সকল গোত্রের ওপর বর্তাবে এবং নবীর আত্মীয় স্বজন ও বনি হাশেম গোত্রের লোকেরা রক্তের বদলা নিতে সমর্থ হবে না। পরিশেষে তারা (বনি হাশেম) রক্তের মূল্য গ্রহণে বাধ্য হবে। এ ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় নবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ প্রাপ্ত হন। এর আগে ইয়াসরেবের গণ্যমান্য ও সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গ নবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, যদি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইয়াসরেবে (মদীনা) আসেন, তাহলে তারা তাদের জান-মাল ও লোকবল দিয়ে নবী (সা.) ও ইসলামের সমর্থন করবেন। আর নবী (সা.) এই চুক্তিকে সামনে রেখেই মক্কার কোরাইশ কাফেররা যে রাতে তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত করে, সে রাতেই মক্কা ত্যাগ করেন এবং হযরত আলী নবী (সা.) এর বিছানায় শুয়ে থাকেন। এভাবে কোরাইশ কাফেররা নবীর গৃহ আক্রমণ করে হযরত আলীর সন্মুখীন হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বারো দিন পর মদীনার নিকটবর্তী 'কোবা' নামক স্থানে পৌঁছান। হযরত আলী যেন তাঁর সাথে যোগ দিতে পারেন, সেজন্য তিনি সেখানে যাত্রা বিরতি করেন। হযরত আলী মক্কায় কয়েক দিন অবস্থান করে নবী (সা.) কর্তৃক অর্পিত

দায়িত্ব পালন শেষে হযরত ফাতেমা ও নবী পরিবারের আরো কয়েকজন নারীকে সাথে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে মুশরিকদের মাধ্যমে বাধাগ্রস্থ হলে হযরত আলী (আ.) তলোয়ার হাতে তুলে নেন। তিনি আক্রমণকারীদের মধ্যে একজনকে হত্যা করেন আর অন্যরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। হযরত আলী (আ.) কয়েক দিন পর নবী করিমের সাথে যোগ দেন। তারপর তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে মদীনা নগরীতে প্রবেশ করেন।

হযরত ফাতেমার মর্যাদা :

আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তনয়া নারীকূলের শ্রেষ্ঠ রমণী হযরত ফাতেমা (সা.আ.) এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার বিপুল সম্মান, মর্যাদা, ন্যায়-নীতি-আদর্শ, স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব যার সামগ্রিক গুণাবলী আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতার অনেক উর্দ্ধে এবং আমাদের সকলের প্রশংসার চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসিত। তিনি পবিত্র কোরআন এবং অসংখ্য হাদীস কর্তৃক ঘোষিত একমাত্র নিষ্পাপ নারী। নবী পত্নী উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি

" تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا " (সূরা আল আহযাব,আয়াত-৩৩)

অর্থাৎ "হে আহলে বাইত! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চান তোমাদেরকে পাপ পঙ্কিলতা থেকে দূরে রাখতে এবং সম্পূর্ণরূপে পূত ও পবিত্র করতে"। আয়াতটির শানে নযুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এ আয়াতটি আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমার গৃহে সাতজন লোক ছিলেন। তারা হলেন জীব্রাঈল (আ.), মিকাইল (আ.), নবী (সা.), আলী (আ.), ফাতেমা (সা.আ.), হাসান ও হোসাইন (আ.)। আর আমি ছিলাম দরজার মুখে। আমি রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য নই ? উত্তরে তিনি বললেন, না তাদের মধ্যে নও, তবে নিশ্চয় তুমি সঠিক পথের উপর আছো, নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণের মধ্যে রয়েছো, তুমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে গণ্য। তিনি এমনই একজন মহীয়সী রমণী যাকে বিশেষ নিষ্পাপ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। যার ক্রোধ ও অসন্তোষকে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর (ফাতেমা) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন শরীফে বলেছেন :

"الْقُرْبَى فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ لَا قُلْ" (সূরা আস-শূরা, আয়াত-২৩)

অর্থাৎ (হে নবী) বলুন আমি আমার রেসালাতের বিনিময়ে আমার পরিবারবর্গের প্রতি ভালবাসা ছাড়া কিছুই চাইনা। আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন "রাসূলুল্লাহ (সা.) ছয় মাস পর্যন্ত ফজর নামাজের সময় ফাতেমার গৃহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন, হে আহলে বাইত, তোমাদের ওপর সালাম ও দরুদ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ইচ্ছা পোষণ করেছেন তোমাদের থেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

তাঁর বিভিন্ন মর্যাদা এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর ও বিভিন্নমুখী পরিচয় আমাদের ন্যায় সীমিত জ্ঞানের মানুষের পক্ষে তুলে ধরা কিভাবে সম্ভব ? সুতরাং স্বয়ং মাসুম ইমামদের থেকে শোনা দরকার। এখানে ইসলামের একজন সম্মানিত নারীর মহিমার কিছু কথা মাসুম ইমামদের পবিত্র মুখ থেকে শ্রবণ করবো :

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে আমাকে বললেন, হাসান ও হোসাইন বেহেশতের যুবকদের সর্দার আর ফাতেমা সকল নারীদের নেত্রী।

রাসূল (সা.) বলেছেন : চারজন রমণী পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম। ইমরানের কন্যা মারিয়াম, খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা এবং মুযাহিমের কন্যা আছিয়া (ফেরাউনের স্ত্রী)।

নবী করীম (সা.) বলেছেন : জান্নাত চারজন নারীর জন্য প্রতীক্ষমাণ। ইমরানের কন্যা মারিয়াম, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজা এবং মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা। তিনি আরো বলেছেন, ফাতেমা কোন ব্যাপারে রাগান্বিত

হলে আল্লাহও তাতে রাগান্বিত হন এবং ফাতেমার আনন্দে আল্লাহও আনন্দিত হন।

ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আ.) বলেন : রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ পৃথিবীর বুকে চারজন নারীকে মনোনীত করেছেন। তারা হলেন মারিয়াম, আছিয়া, খাদীজা ও ফাতেমা (তাদের সকলের উপর সালাম)।

ইমাম আলী ইবনে মুসা আর রেযা (আ.) রাসূলে খোদার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন হাসান ও হোসাইন, আমি এবং তাদের পিতার পরে পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম ব্যক্তি তাদের মা ফাতেমা, আর নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম রমণী।

নবী করিম (সা.) বলেছেন : ফাতেমা বিশ্বের নারীদের নেত্রী। তিনি আরো বলেছেন ফাতেমা বেহেশতের নারীদের নেত্রী।

ইমাম জাফর সাদেকের নিকট জনৈক ব্যক্তি আরজ করলো: রাসূল (সা.) বলেছেন, ফাতেমা বেহেশত্বাসী নারীদের নেত্রী। এর অর্থ কি এটা, যে তিনি তার সমসাময়িক নারীদের নেত্রী ? ইমাম প্রত্যুত্তরে বলেন; উপরোক্ত কথাটি হযরত মারিয়মের ব্যাপারে বলা হয়েছে আর ফাতেমা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নারীদের নেত্রী।

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে রাসূলুল্লাহ, ফাতেমা কি শুধুমাত্র তার যুগের নারীদের নেত্রী ? রাসূল (সা.) প্রত্যুত্তরে বললেন : এ কথাটি ইমরানের কন্য মারিয়ামের ব্যাপারে বলা হয়েছে আর মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নারীদের নেত্রী।

হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশ থেকে ধ্বনি আসবে, হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের মাথা নিচু কর, চক্ষু বন্ধ কর, ফাতেমা এখান থেকে অতিক্রম করছে। আর সত্তর হাজার বেহেশতী হুর তাঁর সঙ্গে আছে।

রাসূলে আকরাম (সা.) হযরত ফাতেমাকে বলেছেন: হে ফাতেমা ! আল্লাহ তা'আলা জমিনের বুকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সেখান থেকে তোমার স্বামীকে মনোনীত করলেন। তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানালেন যে, আমি যেন তোমাকে আলীর সাথে বিয়ে দিই। তুমি কি জান যে, আল্লাহ তোমার মর্যাদা ও সম্মানের দিকে তাকিয়ে তোমাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলেন যিনি সবার আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন এবং যার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সবচেয়ে বেশী আর জ্ঞান সকলের চেয়ে অধিক।

বিবাহ :

হিজরী দ্বিতীয় বছরে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ফাতেমাকে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। হযরত ফাতেমাকে বিয়ে করার জন্য আরবের অনেক শীর্ষস্থানীয় ও ধনবান ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাব নিয়ে আসেন কিন্তু মহানবী (সা.) সকল প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি বলেন ফাতেমার বিয়ে আল্লাহর নির্দেশক্রমে সংঘটিত হবে।

হযরত আলী (আ.) যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আগমন করেন তখন রাসূল (সা.) বলেছিলেন, তোমার আগমনের পূর্বে অনেকেই ফাতেমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। প্রতিটি প্রস্তাবের বিষয়ে ফাতেমার সাথে আলোচনা করেছি। তখন ফাতেমার চেহারায় স্পষ্ট অনীহা ও বিরক্তিভাব লক্ষ্য করেছি। এখন তুমি আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা কর। তখন রাসূল (সা.) হযরত ফাতেমার নিকট গমন করেন। তিনি হযরত আলীর প্রস্তাবের কথা হযরত ফাতেমাকে বলেন। প্রস্তাব শুনে হযরত ফাতেমা নিশ্চুপ রইলেন কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলেন না। অত:পর রাসূল (সা.) উঠে দাড়ালেন এবং বললেন : আলস্লাহু আকবার, তাঁর নীরবতা সম্মতির লক্ষণ।

হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফাতেমা (সা.আ.) এর বিয়ের মোহরানা ছিল শুধুমাত্র একটি বর্ম, যা বিক্রি করা হয়েছিল। আর তার কিছু অর্থ দিয়ে উপহার হিসেবে নিম্নলিখিত কিছু জিনিস হযরত ফাতেমার জন্য ক্রয় করেছিলেন :

- একটি পোশাক।
- একটি বড় স্কার্ট।

- একটি খায়বরী কালো তোয়ালে।
- একটি বিছানা
- দু'টি তোষক, একটি পশম আর অপরটি খেজুর গাছের পাতা দিয়ে তৈরী।
- চারটি বালিশ।
- একটি পশমের তৈরী পর্দা।
- একটি পাটি এবং একটি চাটাই।
- একটি যাঁতাকল।
- একটি তামার গামলা।
- একটি চামড়ার পাত্র।
- একটি মশক।
- দুধের জন্য একটি বদনা।
- সবুজ রংয়ের একটি পাত্র।
- কয়েকটি মাটির জগ।

ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেন: যদি আল্লাহ আমিরুল মু'মিনীন আলী (আ.) কে ফাতেমার জন্য সৃষ্টি না করতেন তাহলে তাঁর জন্য ভূপৃষ্ঠে তাঁর যোগ্য কোন স্বামীই পাওয়া যেত না।
হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন : ইমাম সাদেক (আ.) " يَلْتَقِيَانِ الْبَحْرَيْنِ مَرَجَ " অর্থাৎ দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন যেন তারা পরস্পর মিলিত হয়।(আর রহমান, আয়াত-১৯) আয়াতটির তাফসীরে বলেন: 'উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা'। আর " وَالْمَرْجَانُ اللُّؤْلُؤُ مِنْهُمَا يَخْرُجُ" অর্থাৎ তাদের দু'জন থেকে মুক্তা ও প্রবাল নির্গত হবে।((আর রহমান, আয়াত-২২) আয়াতটির তাফসীরে তিনি বলেন: উক্ত আয়াতটির উদ্দেশ্য ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (আ.)।

ইবাদত বন্দেগী :

ইমাম সাদেক (আ.) এর কাছে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, কেন হযরত ফাতেমা কে যাহরা বা আলোকোজ্বল বলা হয়েছে ? উত্তরে তিনি বলেন : তার কারণ হচ্ছে, হযরত ফাতেমা যখন ইবাদতের উদ্দেশ্যে মেহ্‌রাবে দন্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর নূর আসমানের অধিবাসীদের জন্য প্রজ্বলিত হয়ে উঠতো, যেমনিভাবে জমিনের অধিবাসীদের জন্য আকাশের তারকা আলোকোজ্বল দৃষ্ট হয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে : যখন হযরত ফাতেমা (সা.আ.) নামাজে বা ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন হতেন এবং তাঁর শিশু সন্তানরা ক্রন্দন করতো, তখন তিনি দেখতে পেতেন যে, কোন একজন ফেরেশতা সেই শিশুটির দোলনা দোলাচ্ছেন।
ইমাম বাকের (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: রাসূল (সা.) কোন কাজের জন্য হযরত সালমানকে হযরত ফাতেমার গৃহে প্রেরণ করেন। হযরত সালমান বর্ণনা করেছেন: হযরত ফাতেমার গৃহের দ্বারে দাড়িয়ে সালাম জানালাম। সেখান থেকেই গৃহাভ্যন্তরে ফাতেমার কোরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল আর হস্তচালিত যাঁতাকলটি যা আটা তৈরীর জন্য ঘরে ব্যবহার করা হত তা তার থেকে কিছু দূরে নিজে নিজেই ঘুরছিল।

অপরের জন্য দোয়া :

ইমাম হাসান (আ.) বলেন: এক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে আমার মাকে ইবাদতে দন্ডায়মান দেখতে পেলাম। তিনি সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামাজ ও প্রার্থনারত ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি মুমিন ভাই বোনদের জন্য তাদের নাম ধরে দোয়া করলেন কিন্তু নিজের জন্য কোন দোয়াই করলেন না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা! আপনি যেভাবে অন্যের জন্য দোয়া করলেন সেভাবে কেন নিজের জন্য দোয়া করলেন না ? উত্তরে তিনি বললেন : হে বৎস! প্রথমে প্রতিবেশীদের জন্য, তারপর নিজেদের জন্য।

"الدار ثم الجار "

হযরত ফাতেমার প্রতি নবী (সা.) এর ভালবাসা :

যে সমস্ত মহিমান্বিত বিষয় হযরত ফাতেমার (সা.আ.) আলোকোজ্বল জীবনীকে আরো অধিক মর্যাদাকর করে তুলেছে, তা হচ্ছে তাঁর প্রতি মহানবীর (সা.) অত্যাধিক স্নেহ ও ভালবাসা। মহানবী (সা.) তাঁকে অসম্ভব ভালবাসতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে সত্য ও ন্যায়ের মানদন্ড কোরআনের পাশাপাশি তাঁর মুখনি:সৃত বাণী, তাঁর কাজ, মৌন সম্মতি, সবই শরীয়তের দলীল প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন :

"يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ ۞ الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا "

অর্থাৎ তিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না। বরং (তাঁর কথা) ওহী বৈ কিছু নয়, যা তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়।(সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪)

নিম্নে হযরত ফাতেমার প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সীমাহীন ভালবাসার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :

রাসূলে আকরাম (সা.) যখনই কোন সফরের জন্য বের হতেন, তখন সবশেষে ফাতেমার কাছ থেকে বিদায় নিতেন। আবার যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন সর্বপ্রথমেই হযরত ফাতেমার (সা.আ.) সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

হাকেম নিশাপুরী সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম (সা.) ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : আমার পিতা ও মাতা তোমার জন্য উৎসর্গকৃত হোক।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, যখন হযরত ফাতেমা নবী (সা.) এর নিকট আসতেন তখন তিনি দাড়িয়ে তাঁকে স্বাগতম জানাতেন, তাঁর হাত ধরে চুমু খেতেন এবং তাঁকে নিজের জায়গায় বসাতেন।

ইমাম সাদেক (আ.) এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ফাতেমা (সা.আ.) বলেছেন : যখন

" بَعْضًا بَعْضِكُمْ كَدُعَاءِ بَيْنَكُمْ الرَّسُولِ دُعَاءَ تَجْعَلُوا لَا "

অর্থাৎ রাসূলকে (আহবান করার সময়) তোমরা তোমাদের মধ্যে পরস্পরকে যেভাবে আহবান কর, সেভাবে আহবান করো না (তাকে ইয়া রাসূলুল্লাহ আহবান করবে)।(সূরা নুর, আয়াত-৬৩) এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম যে, কখনো যেন আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ এর স্থানে হে পিতা বলে সম্বোধন না করে ফেলি। তখন থেকে আমি আমার পিতাকে ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলে সম্বোধন করা শুরু করলাম। প্রথম দুই অথবা তিনবার এরূপ আহ্বান শ্রবণ করার পর নবী (সা.) আমাকে কিছু না বললেও এরপর আমার দিকে ফিরে বললেন: হে ফাতেমা! উক্ত আয়াতটি তোমার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়নি। আর তোমার পরিবার ও বংশের জন্যও অবতীর্ণ হয়নি। তুমি আমা থেকে আর আমিও তোমা থেকে। এ

আয়াতটি কোরাইশ গোত্রের মন্দ ও অনধিকার চর্চাকারী লোকদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যারা বিদ্রোহী ও অহংকারী। তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে 'হে পিতা' বলে সম্বোধন করবে। তোমার এরূপ আহ্বান আমার হৃদয়কে সতেজ এবং মহান আল্লাহকে অধিক সন্তুষ্ট করে।

রাসুলে আকরাম (সা.) বলেছেন : আমার কন্যা ফাতেমা পৃথিবীর প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সকল নারীদের নেত্রী। সে আমার দেহের অংশ এবং আমার নয়নের মণি। ফাতেমা আমার হৃদয়ের ফসল এবং দেহের মধ্যে আমার অন্তরের সমতুল্য। ফাতেমা মানুষরূপী একটি হুর। যখন সে ইবাদতে দন্ডায়মান হয় তখন পৃথিবীর বুকে নক্ষত্র সমূহের মত তাঁর জ্যোতি আসমানের ফেরেশতাদের জন্য প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। আর তখন মহান স্রষ্টা তাঁর ফেরেশতাদের বলেন: "হে আমার ফেরেশতাকূল, আমার দাসী ফাতেমা, আমার অন্যান্য দাসীদের নেত্রী। তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখ সে আমার ইবাদতে দন্ডায়মান এবং আমার ভয়ে তাঁর দেহ কম্পিত। সে আমার ইবাদতে মশগুল। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাঁর অনুসারীদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করবো।

মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : " آذَاهَا مَا وَيُؤْذِينِى رَابَهَا مَا يَرِيبُنِى مِنِّى بَضْعَةٌ ابْنَتِى فَإِنَّمَا " ফাতেমা আমার (দেহের) অংশ, যে তাঁকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করলো, সে আমাকেই ক্রোধান্বিত করলো। আর যে তাঁকে সন্তুষ্ট করল সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল। এই হাদিসটি সামান্য শব্দের তারতম্য ভেদে সীহাহ সীত্তাহ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন : " إن الله يغضب لغضب بك ويرضى لرضاك " অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তোমার ক্রোধে ক্রোধান্বিত এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।

ফাতেমার ক্রোধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ক্রোধান্বিত হওয়ার বিষয়টি অসংখ্য গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এসব হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ফাতেমাকে অসন্তোষ বা ক্রোধান্বিত করা নিষিদ্ধ ও হারাম এবং তাকে সন্তুষ্ট করা অপরিহার্য। তাকে অসন্তুষ্ট করা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার শামিল। যেমনিভাবে তাকে সন্তুষ্ট করা মহান প্রতিপালকের রহমতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণ। যখন মহান আল্লাহ তা'আলা কারো ওপর রাগান্বিত হন, তখন নি:সন্দেহে সে জাহান্নামে পতিত হবে। স্বয়ং আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন :

" هَوَى فَقَدْ غَضَبِي عَلَيْهِ يَحْلِلْ وَمَنْ غَضَبِي عَلَيْكُمْ فَيَحِلَّ فِيهِ تَطْغَوْا وَلَا رَزَقْنَاكُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِنْ كُلُوا "

অর্থাৎ তোমাদের আমি যা ভালো খাবার দান করেছি তা খাও এবং তাতে বাড়াবাড়ি করোনা, নতুবা তোমাদের উপর আমার গযব অবধারিত হয়ে যাবে, আর যার উপর আমার গযব নাযিল হবে সে তো ধ্বংসই হয়ে যাবে। (সূরা আত-তোহা, আয়াত- ৬৩)

গ্রন্থসূচী :

১. কাশফুল গুম্মাহ, আলী বিন ঈসা আরদাবিলী।

২. বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসী।

৩. বাইতুল আহযান, মুহাদ্দীস কোমী।

৪. আমালী, শেখ সাদুক।

৫. ইলালুশ শারীয়াহ, মুহাম্মদ বিন আলী বিন আল হেসাঈন আল-কুমী।

৬. তাযকিরাতুল খাওয়াস, সিবতে ইবনে জাওযী, নাজাফ থেকে প্রকাশিত।

৭. কামিল, বাহায়ী।

৮. মানাকিব, মুহাম্মদ বিন শাহরে আশুব মাজেন্দারনী।

৯. উসূলে কফি, মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কুলাইনি।
১০. মুনতাহাল আমাল, শেখ মুফিদ।
১১. তারিখে ইয়াকুবী, আহমাদ বিন আবি ইয়াকুব, বৈরুত প্রিন্ট।
১২. আমালী, শেখ তুসী।
১৩. সহীহ বুখারী, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী।
১৪. ফুসুলুল মুখতারাহ, শেখ মুফিদ।
১৫. রাওহা আল কাফি,ইসলামিয়া প্রকাশনা, তেহরান,
১৬. ফুসুলুল মুহিম্মা, ইববে আস্ সিবাগ আল্ মালেকী।
১৭. সহীহ আত্ তিরমিযি, ঈসা মুহাম্মদ বিন ইসা তিরমিযি।
১৮. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ।
১৯. আদ্ দূররুল মানসুর, জালাল উদ্দিন আব্দুর রহমান আস-সূয়ূতি।
২০. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসমাঈল বিন কাসির।
২১. খিসাল, শেখ সাদুক।
২২. সহীহ মুসলিম, মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী।
২৩. সুনানে আবি দাউদ, আবু দাউদ সোলায়মান।
২৪. সুনানে নাসাঈ, আবি আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শোয়ায়েব।
২৫. আল মুসতাদরাক আলা সহীহাঈন, হাকেম নিশাপুরী।